Dhrubapad – Prabandho - Pather Panchali : Upanaysh O Chalachchitro – Taradas Bandhopadhyay

ধ্রুবপদ - পথের পাঁচালী উপন্যাস ও চলচ্চিতর - তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার সংস্কৃতি ইতিহাসে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ একটি বিশেষ তাৎপর্যের সূচক হয়ে থাকবে। এই বছরে পালিত হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসের ৭৫তম বর্ষ এবং সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের ৫০ তম বর্ষপূর্তি। প্রথম ঘটনাটির সময় আমার জন্ম প্রায় দুই দশক ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন আমার স্মৃতিতে ধরা আছে। গত বছরটি তাই কেটেছে একটা অদ্ভুত মিশ্র মনোভাবের ভেতর দিয়ে। একদিকে খুশি হয়েছি ফিল্মোৎসাহী মানুষের নিবেদিতপ্রাণ উৎসবপালনের সমারোহ দেখে, দুয়েকটি অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তারা ব্যতিক্রমী সচেতনতার পরিচয় দিয়ে পথের পাঁচালী উপন্যাস রচয়িতার পরিবারের বর্তমান সদস্যদের আমন্ত্রণের তালিকাতেও রেখেছিলেন) অপরদিকে বিষণ্ণতা অনুভব করেছি এই দেখে যে, এই বাঙালিরাই উপন্যাসটির প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের কথা প্রায় ভুলে যেতে পারলেন। অবশ্য চলচ্চিত্র মাধ্যমের দ্রুত প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা মুদ্রিত অক্ষরের চেয়ে বেশি, বোধহয় সেই কারণেই জয়ন্তী উৎসবের সেলুলয়েড তথা সাহিত্যভিত্তিক অনুপাত ৯৫ ৫ বা ওই রকম কিছু এটাই বর্তমানকালের প্রবণতা। এর একটা স্পষ্ট কারণও আছে। দশটি প্রেক্ষাপটে যদি একটি ছবি মুক্তি পায় এবং প্রত্যেক হাউসে গড়ে এক হাজারটি আসন থাকে তাহলে মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার। দিনে তিনটি প্রদর্শনী হলে দর্শক সংখ্যা হয় ত্রিশ হাজার ।সত্যিকারের ভালো ছবি দেখতে কখনোই প্রত্যেকটি আসন পূর্ণ হয়না, আমি নিষ্ঠুরের মতো এই সংখ্যা কমিয়ে মাত্র পাঁচহাজার যদি ধরি, তাহলে ছবি এক সপ্তাহ চললেও পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শকের কাছে তা পৌঁছে যাচ্ছে। অপরদিকে সাধারণভাবে বাংলা উপন্যাস প্রতি সংস্করণে এক হাজার কপি ছাপা হয়। সেই একহাজার বই বিক্রি হতে কম সময় লাগে বা নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে) যেমন লেখক কে, তাঁর জনপ্রিয়তা কতটুকু, ইত্যাদি। সেক্ষেত্রেও ভালো বইয়ের বিক্রি ধীরগতিতে হয়ে থাকে বলে অনেক ধ্রুপদী রচনার এক এক মুদ্রণ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশকের ঘরে পড়ে আছে দেখেছি। তার ওপর বর্তমান যুগে এসেছে ভিডিও, সিডি, দূরদর্শন। এমনকি পছন্দসই ছবির রিপিট অডিয়েন্স হতে গেলেও আর সেজেগুজে হাউসে যাবার প্রয়োজন পড়ে না, বাড়িতে বসেই সারা যায়।

এ ধরনের আলোচনা বেশিদূর বিস্তৃত হলে বিতর্ক আকর্ষণ করে। তার প্রয়োজনও নেই, কারণ স্বল্পসংখ্যক হলেও কিছু বিশিষ্ট মানুষ বিভিন্ন পত্র - পত্রিকার মূল উপন্যাসের প্রতি এই উদাসীনতার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নিরন্তর তমিস্রা নয়, প্রদীপ কোথাও কোথাও জ্বলছে।

অন্য গভীর বিচারের কথা বাদ দিলেও পথের পাঁচালী প্রাথমিকভাবে একটি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতেই পারে) তা হল এই যে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ রচনা করে যে বিরল কয়েকজন লেখক অপরিচয়ের প্রান্ত থেকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন, পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণকে তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

Bibhutibhushon's career is singular in this that he leapt from obscurity of the height of fame with one novel, Pather Panchali ('The Balled of the Road$) an idyll of village life, and one of the completely satisfying Bengali novels."[১]

এই উপন্যাসের প্রসঙ্গে আরো কিছু গভীর এবং সুন্দর কথা উচ্চারণ করেছেন বুদ্ধদেববাবু, বলেছেন

…It is a book of great beauty, the beauty of childhood and old age, of furrows and flowers, of distances, and of innocence. Neither Saratchandra's conspiratorial crookedness nor Tarashankar's Processional clangor has any place in Bibhutibushan's village; his characters are simple and incidents common, there is nothing unusual or out of the way, and nothing commonplace or trivial or dull, this achievement, I think we *

১. An Acre of Green Grass: Buddhadev Bose. Orient Longmans Ltd. ১৯৪৮

*owe entirely to his awareness of Nature which Saratchandra and some later novelists remarkably lack. …Pather Panchali, reading which one makes what I think is an important discovery: that in Bengal it is still possible for an artist to be at once innocent and intelligent.[2]

'innocence' শব্দটির সঠিক বাংলা কী হবে বুঝে উঠতে পারছিনা। 'নিষ্পাপ' বা 'অপাপবিদ্ধ' ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের আত্মা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়না। সারল্যই বোধকরি কাছাকাছি যায়। বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন ও গদ্যের সারল্য প্রসঙ্গে অনেক সমালোচক/গবেষক অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে একটা কথা বোধহয় আমাদের পূর্বেই বুঝে নিতে হবে। সারল্য বা simplicity, দুই ধরনের হতে পারে। এক, জীবনের বিশাল পটভূমিতে মানবাত্মার নির্মল, অনির্ভর, মুক্ত প্রসারে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে এক বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি - যা ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে লব্ধ তথ্যের সঙ্গে চেতনার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। দুই, এমন এক সারল্য যার ভেতর পূর্বে বর্ণিত প্রত্যেকটি শর্তই বর্তমান, এবং তার সঙ্গে মিশেছে চিন্তন ও পঠনপাঠন লব্ধ তথ্যের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সচেতনতার ফসল। প্রথমটি ততটা আয়াসলব্ধ নয়, দ্বিতীয়টি সুকঠিন। কারণ দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত চিত্তের অমলিন পট বা tabul এর ওপরে বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের আঁচড় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক সরলাবস্থা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। আসে প্রশ্ন, আসে সংশয়, আসে অপরীক্ষিত, অবিশ্লেষিত আবেগকে আপাতমূল্যে গ্রহণ না করার প্রবণতা। এসব অনিবার্য হয়ে পড়লে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে প্রাপ্তব্য অনাবিল আনন্দের উৎসার যুক্তিবুদ্ধির শুষ্কভূমিতে বিলুপ্ত হয়ে আসে। উপায় নেই। প্রবচনে আছে- There is no free lunch in the world, কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। জ্ঞানের মূল্য হল সারল্য। এই অসম্ভবকে বিভুতিভূষণ কী এক আশ্চর্য মন্ত্রে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এই মন্ত্রের নাম পূর্ণতা। গণিতশাস্ত্রে বলে অনন্ত বা পূর্ণতা এক আশ্চর্য জিনিস, যে কোনো মাত্রার সংযোজন বা বিয়োজনে এর কোনো বিকৃতি ঘটেনা। উপলব্ধির গাঢ়তা দিয়ে বিভূতিভূষণ এই পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। ফলে যুক্তি, বুদ্ধি, পার্থিব ঘটনাবলীর আবর্ত, সাহিত্য কিম্বা দর্শনের প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণ কিছুই তাঁর অনুভবের বিশুদ্ধতাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। ব্ল্যাকবোর্ডে কর্মরত অবস্থায় গৃহীত আইনস্টাইনের বিখ্যাত আলোকচিত্রের চোখদুটি কথা স্মরণ করুন, অথবা ভেবে দেখুন, স্ট্যানলি কুব্‌বিকের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র '২০০১ এ স্পেস অডিসি'-র শেষ দৃশ্যে অনন্ত মহাকাশে ভাসমান মাতৃগর্ভাশয়ের মতো একটি আধারে সেই মানবভ্রূণের অপলক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ। বিশ্বের তাবৎ মহত্ত্ব, বিশালতা, প্রসার, গভীরতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, সাফল্য, ব্যর্থতা, শোক, হর্ষ - সমস্তই পূর্ণতার মোড়কে বিভূতিভূষণের করতলগত ছিল।এমন সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আংশিক বিচার আমাদের সত্যের কাছে পৌঁছে দেবে না। অথচ সেটাই কিন্তু বারবার এই লেখকের ভাগ্যে ঘটেছে। তাঁর গদ্যশৈলীর সহজ প্রবাহকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্বভাবকবির উচ্ছ্বাস হিসেবে। এই সহজতার পেছনে যে বিপুলশ্রম ও মনন লুকানো আছে তার সমস্ত চিহ্ন লেখক নিঃশেষে মুছে দিয়েছেন। ওয়র অ্যান্ড পীস পড়ে কি ধারণা করা যায় বইটি টলস্টয় একাধিকবার পুনর্লিখন করেছিলেন? পথের পাঁচালী-র মসৃণ গদ্যের পেছনে রয়েছে শত শত পাতা খসড়া তৈরি এবং পরিকল্পনারপ্রকরণগত নিষ্ঠা। উপন্যাসটি যত পাতার তার চেয়েও বেশি খসড়ার ছক করেছিলেন বিভূতিভূষণ। এর সমগ্র অংশ পাওয়া না গেলেও যা রয়েছে তা সেই ইঙ্গিতই দেয়।

শিয়ালদহের কাছে তৎকালীন রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিস্টিংশন নিয়ে স্নাতক হবার পর বিভূতিভূষণ হরিনাভি ও জাঙ্গিপাড়ার দুটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। হরিনাভিতে কাজ করার সময় থাকতেন রাজপুরের একটি বড় বাড়ির বাইরের দিকের একখানি একটেরে ঘরে। সেখানেই মাতৃদেবী মৃণালিনীর মৃত্যু হয়। পিতা মহানন্দ মারা যায় বিভূতিভূষণ যখন ক্লাস এইটের ছাত্র। এবং জাহ্নবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ভ্রাতা নুটুবিহারী ক্ল্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ডাক্তারি পড়েন। নির্জন, নিঃসঙ্গ জীবন বিভূতিভূষণের। জাঙ্গিপাড়ার শিক্ষকতা করার সময়ে একবার খুব জ্বর হয়েছিল। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে দেবেন অসহ্য পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে টলতে টলতে ঘরের কোণে রাখা কুঁজো উপুড় করে দেখেন তাতে একফোঁটাওজল নেই। কোনোরকমে দরজা খুলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠোন পার হয়ে পুকুরের ঘাটে গিয়ে নিচু হয়ে মুখ ডুবিয়ে জ ল খেয়েছিলেন।

এর পরে বিভিন্ন যোগাযোগে তিনি পাথুরিয়াঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষ-এর ভাগলপুরের বিস্তীর্ণ জমিদারীতে ম্যানেজারের পদ পেয়ে চলে যান। নির্জন জীবন নির্জনতর হয়ে পড়ে। কলকাতায় তবু চারিদিকে বাঙালি, বাংলাভাষী। প্রিয় ইমপিরিয়াল লাইব্রেরি। সেই সুদূর অরণ্যপ্রবাসে মাইলের পর মাইল ঝাউবন, কাশঝাড়, বালিয়াড়ি, কোথাও ঘন পাদপের ছায়া) এবং সঙ্গীহীন দিনরাত্রি। প্রথমে ভেবেছিলেন সেখানে থাকতে পারবেন না, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু একটু একটু করে ওই নির্জনতা, দিনে বহ্নিজ্বালাময় খর সূর্যের দিগদিগন্তব্যাপী রুদ্রলীলা, রাত্রিতে কাশের খুপড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া দিগন্তলগ্ন কালপুরুষেরঅগ্নিসংকেত, সরল দেহাতি মানুষদের অকৃত্রিম স্মৃতির রেখায়-য় (ক্যালকাটা পাবলিশার্স প্রকাশিত, যার প্রথম সংস্করণটির প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায় করে দিয়েছিলেন) এই সময়কার কথা প্রায় মহাকাব্যিক উপলব্ধির সঙ্গে বর্ণিত আছে। যদিও এই দিনলিপি লেখার সময় তিনি কল্পনাও করতে পারেননি কোনোদিন একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে বিভূতিভূষণের জন্মশতবর্ষে স্মৃতির রেখা-র পাণ্ডুলিপি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

অপরাজিত-তে ছিন্দ্ওয়ারার জঙ্গল থেকে ফিরে কলকাতায় থিয়েটার দেখতে গিয়ে কলেজ জীবনের সহপাঠী সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা হয়ে অপু যেমন বলেছিলেন - 'I felt so homesick for Bengal.', তেমনি ভাগলপুর প্রবাসে বিভূতিভূষণ নিজের পৈতৃক গ্রাম, সেখানকার প্রকৃতি, ইছামতী নদী ইত্যাদির কথা মনে পড়েবিষণ্ণ হয়ে যেতেন। বিভূতিভূষণের বিভিন্ন দিনলিপিতে এই গ্রামের কথা অসংখ্যবার উল্লিখিত হয়েছে। গ্রামের নাম বারাকপুর। শিয়ালদহ মেন লাইনের উপর অবস্থিত ক্যান্টনমেন্ট শহর বারাকপুর নয়, এটি বনগ্রাম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ইছামতী তীরের একটি ছোট্ট গ্রাম। বিভূতিভূষণের পিতামহ তারিণীচরণ বসিরহাটের ইছামতী নদীর ওপরে পানিতর গ্রাম থেকে বাস উঠিয়ে বারাকপুর গ্রামে এসে বাস করেন। পেশায় কবিরাজ ছিলেন। বিভূতিভূষণের রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ইছামতী-র রামকানাই কবিরাজের চরিত্রটি এঁরই ছায়ায় রচিত। বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন কাঁচরাপাড়ার কাছে মুরাতিপুর গ্রামের মাতুলালয়ে। কিন্তু তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন কেটেছে এই বারাকপুর গ্রামে। যদিও একটানা নয়, অধ্যয়ন, জীবিকা ইত্যাদির দাবিতে তাঁকে মাঝেমাঝেই বেশ বড় সময় কাটাতে হয়েছে কলকাতায় বা আরো দূর প্রবাসে। কিন্তু সেখানেই থাকুক না কেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো তাঁর মন পড়ে থাকত শৈশবস্মৃতিমণ্ডিত যশোর জেলার শ্যামাছায়াঘন এই প্রত্যন্ত গ্রামটিতে। এই গ্রামই পথের পাঁচালী-র নিশ্চিন্দিপুর। এই গ্রামের কাছেই নিশ্চিন্দিপুর নামে সত্যিই একটা গ্রাম আছে। উপন্যাসের মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে নামটি প্রতীকী ইঙ্গিতবহ হওয়ায় সামান্য ভৌগোলিক ব্যবধান উপেক্ষা করে নিশ্চিন্দিপুর নামটিই বিভূতিভূষণ ব্যবহার করেছেন। সবদিক বিচার করলে বোঝা যায়এর চেয়ে যথাযথ নাম আর কিছু হতে পারত না।

এই মনখারাপ করাকে অবলম্বন করেই বিভূতিভূষণ ভাগলপুর প্রবাসে বসে লিখতে শুরু করেন পথের পাঁচালী। আশ্চর্যের বিষয়, লিখতে শুরু করার সময় উপন্যাসে দুর্গার চরিত্র ছিল না। অনেকদূর যখন লেখা এগিয়ে গিয়েছে, তখন একদিন জমিদারী সংক্রান্ত আদালতের কী কাজে ভাগলপুর শহরে যেতে হয়েছিল বিভূতিভূষণকে। অপরাহ্নবেলায় কাজ সেরে ফেরার সময় কোর্টের পিছনদিকে সিঁড়ির ধাপে এগারো - বারো বছরের একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখেন। শ্যামবর্ণ, পাতলা চেহারা, পরনে একটি কমদামিসাধারণ ডুরে শাড়ি। তৈলহীন রুক্ষ একগোছা চুল বাতাসে উড়ছে। একমুঠো তেঁতুলবিচি নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে আবার হাত পেপতে ধরে আপনমনে খেলা করছে মেয়েটি। অবাক হয়ে বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন এই আশ্চর্য দৃশ্য। বিশ্বের অনেক বড় ঘটনা ানেক সময় খুব তুচ্ছ অঙ্কুর থেকে উৎসারিত হয়। দরিদ্রঘরে অনাদৃতা, সাধারণ প্রাকৃতিক উপকরণ নিয়ে ক্রীড়ারতা এই বালিকাটির ছবি বিভূতিভূষণের হৃদয়ে এমনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করল যে তিনি কাছারিতে ফিরে এসে পথের পাঁচালী যতদূর লিখেছিলেন সবটুকু পাণ্ডুলিপি বাতিল করে নিয়ে আবার নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। এবার তাতে রইল দুর্গার চরিত্র।

ভাবলে গায়ে শিহরণ জাগে। কে সেই মেয়েটি? কী নাম ছিল তার? কাদের মেয়ে ছিল সে? কোথায় তার বিয়ে হয়, কোথায়ই বা সংসার করেছিল সে? কেউ জানে না। বিভূতিভূষণও জানতেন না। পরে অনেকবারই নানা কাজে গিয়েছেন ভাগলপুর আদালত, কিন্তু বালিকাকে আর দেখেননি। যদি বেঁচেও থাকে, যদিও তা প্রায় অসম্ভব, তবে তার বয়েস এখন অন্ততপক্ষে বিরানব্বই। এই অজানা, অনামী মেয়েটি বিশ্বসাহিত্যের এক অমর চরিত্র হয়ে রয়ে গেল।

'বিচিত্রা'-র সম্পাদক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হয়েছিল ভাগলপুরের 'বড়বাসা' নামে একটি বাড়িতে। জমিদারীর কাজে ভাগলপুর এলে লেখক 'বড়বাসা'তেই রাত্রিযাপন করেন। বাড়িটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেখ সাহিত্যিকের স্মৃতিধন্য। পথের পাঁচালী যতদূর লেখা এগিয়েছে তা মাঝে মাঝে উপেনবাবুকে শোনাতেন বিভূতিভূষণ সম্পাদকীয় দপ্তরের আগ্রহকে ত্বরান্বিত করতে পারলেন না। একদিন বিকেলে পত্রিকার অফিসে গিয়েছেন। গিয়ে দেখেন উপেনবাবু নেই, কিন্তু তৎকালীন কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তথা সমালোচক বসে আছে। তাঁদের মধ্যে একজন (নামটা উল্লেখ নাই বা করলাম) জিজ্ঞাসা করলেন 'কী চাই'? বিভূতিভূষণ বললেন - 'একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা ছিল। সেটার সম্বন্ধে সম্পাদক খোঁজ নিতে বলেছিলেন।' প্রশ্নকর্তা একটু যেন অবাক হয়ে হললেন) 'খোঁজ নিতে বলেছিলেন? কী নাম লেখার?' বিভূতিভূষণ বললেন - পথের পাঁচালী/ ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের স্বরে বললেন - 'ওসব পাঁচালী -টাঁচালী এখানে ছাপা হয় না। আপনি বরং চিৎপুর রোডে চেষ্টা করুন গে'।

বিভূতিভূষণ দুঃখিত হয়ে বললেন - 'কিন্তু উপেনবাবু আমাকে কথা দিয়েছিলেন বইটি তিনি ছাপবেন।'

ভদ্রলোক বললেন) 'তাতে কী? You may have been elbowed out'

বিভূতিভূষণ দুঃখিত এবং বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে ব্যাপারটা জানালেন তাঁর পরমসুহৃদ নীরদ চৌধুরীকে (বিখ্যাত লেখক ও প্রাবন্ধিক Nirid C Choudhury) . নীরদবাবু মির্জাপুর স্ট্রিটে বিভূতিভূষণের সঙ্গে একই মেসে বহুদিন ছিলেন। নীরদবাবুর কথা অভিযাত্রিক নামে ভ্রমণকাহিনীতেএবং বহু দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ অসংখ্যবার লিখেছেন। খবর শুনে নীরদবাবু পরের দিনই 'বিচিত্রা'-র দপ্তরে উপস্থিত হলেন, এবং বিভূতিভূষণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে এলেন। নীরদ সি. চৌধুরীর সঙ্গে বিতর্কে জয়লাভ করা চিরকালই কঠিন ছিল। অবশেষে উপেনবাবু পরীক্ষামূলকভাবে দু'তিন কিস্তি লেখাটি প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। অনুচ্চারিত এমন সর্ত রইল যে, পাঠকের পছন্দ না হলে বা পত্রিকার মোট বিক্রি সংখ্যার ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে পথের পাঁচালী-র প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

তা করতে হয়নি। দুটি কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ক্রমশ বাড়তে থাকে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা। উপন্যাসের তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক পাঠক, এমনও বলতে থাকেন যে, পথের পাঁচালী শেষ হলে তাঁরা 'বিচিত্রা' নেওয়া বন্ধ করে দেবেন। এরপর থেকে বিভূতিভূষণকে আর কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রকাশকরা অবশ্য প্রাথমিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নতুন লেখকের প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। এখানেও এগিয়ে এলেন আর এক বন্ধু, সম্পাদক-কবি সজনীকান্ত দাস। বিভূতিভূষণের বই বার করতে হবে হলে খুলে ফেললেন নিজের প্রকাশনা। নাম দিলেন রঞ্জন প্রকাশালয়। ১৩৬৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' -তে পথের পাঁচালী-র প্রথম বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়। দাম ছিল তিন টাকা। বিভূতিভূষণের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে বর্তমান সময় পর্যন্ত পথের পাঁচালী-র বহু ধরনের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল উপন্যাসের একাধিক মুদ্রণ তো বটেই, বেরিয়েছিল মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত রে'নি -এ বাঁধাই হাতে তৈরি কাগজে ছাপা সীমিত সংখ্যক রাজ সংস্করণ। প্রতিটি কপিতে বিভূতিভূষণ নিজের নাম সই করে দিয়েছিলেন। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে কিশোরপাঠ্য সংস্করণ, ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে পড়াবার জন্য ক্ষিতীশ রায় অনূদিত বিদ্যালয় পাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য হাফ ফুলস্ক্যাপ কাগজে ছাপা 'মিত্র ও ঘোষ' মুদ্রণ ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালে নভেম্ফর মাসে 'ইউনেস্কো' এবং দিল্লীর 'সাহিত্য অকাদেমি'-র উদ্যোগে পথের পাঁচালী ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরাজি অনুবাদের কাজ করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. ডাবলু ক্লার্ক ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রকাশক Geroge Allen & Unwin। ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় Gallimard প্রকাশন সংস্থা থেকে অনুবাদ করেন মাদাম ফ্রাঁস ভট্টাচার্য (কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী)। ১৯৭৮ সালে দুসান জ্যাবাভিতেল অনূদিত চেক সংস্করণ প্রকাশিত ওয় Mlada Fronta নামে সংস্থা থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইংল্যান্ডের পোলিও সোসাইটি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পী জ্যানেট্ আর্চারের বারোটি লিথোগ্রাফসহ একটি বিশেষ শোভন সংস্করণ সদস্যদের জন্য প্রকাশিত করে। ওই সালের ১১ই জুন তারিখে প্রকাশিত UNESCO Features পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

> The English Version of Pather Panchali is to be issued in a Special Luxuriously bound edition by the Folio Society of Great Britain for its members and so became the first work is more than 130 volumes published in English under UNESCO translation Programme to have been honored by a special book – club edition.

প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ান ও জাপানী অনুবাদও। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর প্রকাশকেরা এ দুটি সংস্করণ লেখকের পরিবারকে পাঠানোর সৌজন্যটুকুও দেখাননি।

এইখানে একটি বেদনাদায়ক বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অধ্যাপক ক্লার্ক এবং মুখোপাধ্যায়কৃত অনুবাদটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। খণ্ডিত, Truncated । অনুবাদ যে এভাবে করা হবে এ বিষয়ে আমাদের পরিবারকে বিশেষ করে আমার মা রমাদেবীকে অধ্যাপকদ্বয়, সাহিত্য অকাদেমি বা ল'নের প্রকাশক কেউই কিছু জানাননি। বই হাতে পেয়ে আমাদের পরিবারের মানুষরা হতবাক। কিন্তু তখন যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছে। অনুবাদের ভূমিকায় অধ্যাপক ক্লার্ক রীতিমত বিস্ময়কর মন্তব্য করেন

> The climax surely is reached when Opu and this parents leave Nishchindipur; and what follows, if the reader goes on with it, is something of an anticlimax. When the train journey to Benaras begins, the cast has already broken up … as the train draws away from the station the last chords of the symphony are struck, and the rest should be silence… this decision finds corroboration in a like decision by others who have in different ways been concerned with the presentation of our story. Satyajit Roy, who produced the filmed version, chose to end at this same point; as did Sajanikanta Das who abbreviated the book for children.

টি. ডাবলু. ক্লার্ক-এর মতো একজন বড় মাপের অধ্যাপক তথা অনুবাদকের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য সত্যিই বিস্ময়কর। নিজের সাহিত্যবিষয়ক অভিমতকে সমর্থন করার জন্য তিনি সহায়তা নিয়েছেন একজন চিত্রপরিচালকের সিদ্ধান্ত থেকে? তাঁর একটু অন্তত বোঝা উচিত ছিল চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য-শিল্পকর্মের দুটি আলাদা শাখা। সত্যজিৎ রায় উপন্যাসের ততটুকু

অংশই গ্রহণকরেছেন যতটুকু ছবির জন্য প্রয়োজন ছিল। বাকিটা বাদ দিয়েছেন সাহিত্যের নিরিখে সেটুকু অপ্রয়োজনীয় বলে নয়, তিনি যেমনভাবে ছবিটিকে উপস্থাপিত করবেন বলে ভেবেছিলেন তার ক্ষেত্রে ওই অংশের দরকার ছিল না বলেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাকি অংশটুকু বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় এমন কোনো কথা তিনি কখনো বলেন নি। অপরাজিত-তে সেটুকু প্রয়োজনমত ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের দাবিতে এই বিভক্তিকরণ। আর সজনীকান্ত দাস উপন্যাসটির একটি কিশোর পাঠ্য সংস্করণ সম্পাদনা করতে গিয়ে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই অপুদের পরিবারের নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত এসে থেমেছেন। এর পরবর্তী আখ্যানভাগের আবেদন কিঞ্চিৎ পরিণততর পাঠকমনের কাছেই সফল হবে বলে হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁদের সেই স্বাধীনতা কোথায়? বিভূতিভূষণের চেয়েওকি তাঁরা ভাল করে বুঝেছিলেন পথের পাঁচালী কোথায় শেষ করলে ভাল হত? এঁদের এই দাম্ভিক, হঠকারী পণ্ডিতম্মন্যতা দেখে জীবনানন্দের অনুসরণে বলতে ইচ্ছে করে - বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি উপন্যাস (কবিতা)। বলা যায় না, অনুরোধ করলেই হয়তো এঁরা 'চোখে অক্ষম পিচুটি' নিয়ে তৎক্ষণাৎ লিখতে বসে যাবেন। অহো দুর্ভাগ্যম্ - অভারতীয় মানুষেরা এই খণ্ডিত অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ, তাঁরা জানতেই পারলেন না বাকি অংশে কী অমৃত লুকোনো রইল। তবে পরবর্তীকালে অনুবাদের অনুমতি দেবারসময় বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী সতর্ক ছিলেন। ফলে ভারতীয় কোনো ভাষাতেই পথের পাঁচালী খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত ওয়নি। কয়েকটি ভাষারসংস্করণের তালিকা দেওয়া গেল (এই মুহূর্তে হাতের কাছে যা তথ্য আছে তা অবলম্বনে)

এক.	মালয়ালম	অনুবাদক বাসুদেব কুরূপ, সাহিত্য অকাদেমির সহযোগিতায়। কোল্লায়াম, ১৯৫৮
দুই.	তামিল	অনুবাদক আর. সম্মুখসুন্দরম্, মার্কারি বুক কোম্পানী, কোয়েমবাটুর, ১৯৬৪
তিন.	তেলেগু	অনুবাদক সাড্ডিপট্ট সুরি, বিদ্যাবাণী পাব্লিশার্স, বিজয়ওয়াড়া, ১৯৬০
চার.	কন্নড়	অনুবাদক এ শঙ্কর (অবলাশঙ্কর), ১৯৬৪, ১৯৭১
পাঁচ.	উর্দু	অনুবাদক ইকবাল কৃষ্ণান, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯১
ছয়.	হিন্দি	অনুবাদক মন্মথনাথ গুপ্ত, রাজপাল অ্যা' সন্স্, দিল্লী, ১৯৫৭

মারাঠি, গুজরাটি, অসমিয়া, ওড়িয়া এবং গুরুমুখী ইত্যাদি অনুবাদের প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের কাছে নেই। কিছুটা আমার আগোছালো স্বভাব এর জন্য দায়ী, কিছুটা দায়ী প্রকাশকদের বই পাঠানোর ক্ষেত্রে উদাসীনতা। যে কারণে Royal Folio Society-র সংস্করণটিও আমার কাছে নেই।

পথের পাঁচালী-র খসড়া ও পুনর্লিখন প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি তার সমর্থন পাই চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণের শ্যালক, গবেষক ও জীবনীকার) রচিত হীরক জয়ন্তী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়-তে। তিনি লিখছেন

...এখন পর্যন্ত পথের পাঁচালী-র যেসব খসড়া বা অমুদ্রিত বা পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির অংশ পাওয়া যায়, তা পরীক্ষা করলে মনে হয় অন্ততঃ তিনবার তিনি উপন্যাসটি লিখেছিলেন। প্রথম খসড়া বোধ হয়ে তিনি 'প্রবাসী'-তে প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হবার পরে পরেই উৎসাহিত হয়ে আরম্ভ করেন। ১৯২২/২৩ খ্রিস্টাব্দেই রচনা আরম্ভ করেছিলেন অনুমান করা যায় - অন্ততঃ কিছু অংশ লিখে রাখছিলেন - ভবিষ্যতে বড় আকারের উপন্যাসটির রূপ দেবেন বলে।'

পথের পাঁচালী-র প্রথম প্রকাশক হিসেবে সজনীকান্ত দাসের কথা বলেছি। এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন-

আমি তখন 'প্রবাসীর'-র সরকারী সম্পাদক। শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহিত সবে আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে। বিভূতিভূষণ একদা তাঁহার সহপাঠী ও এক মেসের অধিবাসী ছিলেন। নীরদচন্দ্র একদিন বিভূতিভূষণকে 'প্রবাসী' আপিসে অধিষ্ঠিত আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় লইয়া আসিলেন। পথের পাঁচালী বই খানির ভদ্র একজন প্রকাশক বাংলাদেশে পাওয়া যাইতেছে না) এই অত্যাশ্চর্য সংবাদে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া সেইদিনই আমি উক্ত পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন ২৫/৩০ টাকায় বাংলা বইয়ের কপিরাইট বিক্রয়ের কাল। আমি প্রথম সংস্করণ পথের পাঁচালীর-র জন্য বিভূতিভূষণকে নগদতিনশ পঁচিশটাকা দিয়া সেই মারাত্মক পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করি। সেই দিন হইতে বাংলা ভাষায় লেখকদের সে সুদিন আসিয়াছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আমি তখন 'প্রবাসী' আপিসের মাত্র মাসিক নব্বই টাকা বেতনের কর্মচারী। বন্ধুবর গোপাল হালদার নোয়াখালি - ফেনীতে তাঁহার বাবার নিকট হইতে তিনশত টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহাই হইল রঞ্জন প্রকাশনালয়ের মূলধন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মহালয়ার দিন ১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর, ১৯২৯) বুধবার পথের পাঁচালী প্রকাশিত হইল। বিভূতিভূষণ গ্রন্থকার পদে ও আমি প্রকাশক পদে উন্নীত হইলাম।'

উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক বলেই হোক বা নিজের প্রথম দীর্ঘ রচনা বলেই হোক, পথের পাঁচালী-র ওপর বাবার অপরিসীম মমতা ছিল। বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিবাহের (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, ইংরেজি ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪০) অনেক পরে আমার জন্ম। আমার আগে মায়ের দুই কন্যা হয়েছিল। একজন মৃতাবস্থায় জন্মায়, অপরজন জন্মের পরে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা জীবিতা ছিল। প্রতি বছর এদের জন্মদিনে মাকে বিষণ্ণ হতে দেখেছি। আমি ভুলে যেতাম, মা কিন্তু তারিখটা ঠিক মনে রাখতেন। মায়ের কাছেই শুনেছি, দুই সন্তানের মৃত্যুতে মানসিক দিক দিয়ে তিনি কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে চুপ করে বসে থাকতেন, মাথার বালিশ সরিয়ে তার নিচে হাতড়ে কী যেন খুঁজতেন। একদিন এই সময়ে বাবার ঘুম ভেঙে যায়। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন) 'কি করছ কল্যাণী?'

মায়ের পোশাকি নাম ছিল রমা, ডাকনাম কল্যাণী। বাবা ডাকনামেই ডাকতেন। এছাড়াও তাঁদের একটা ঘনিষ্ঠ দাম্পত্য - মাধুর্যে-ভরা নাম ছিল, যে নামে আড়ালে তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করতেন। সেটা এখানে আর লিখলাম না। তবে বাবার দুয়েকটি দিনলিপিতে সে নামের নির্ভীক উল্লেখ রয়েছে, কৌতূহলী বিভূতি- অনুরাগীরা খুঁজে দেখতে পারেন।

বাবার প্রশ্নের উত্তরে মা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বললেন - 'আমার গলার হারটা কোথায় গেল? গলার হারটা?'

বাবা পরম মমতায় মাকে ধরে আবার শুইয়ে দিলেন।

বললেন) 'হার তো তোমায় গলাতেই আছে। শান্ত হও, শুয়ে পড়ো।'

সন্তান না থাকার জন্য মা যখন মন খারাপ করতেন, কাঁদতেন, বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতেন - 'কাঁদছ কেন কল্যাণী কে বলল আমাদের সন্তান নেই? পথের পাঁচালী-ই তো আমাদের সন্তান।'

আর সেই সঙ্গে বলতেন - 'এ উপন্যাস কখনো সিনেমা করা যাবে না, জানো? এটা সে ধরনের গল্প নয়। ফিল্ম করতে গেলেই পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনায় যাবার আগে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনী থেকে বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী সম্বন্ধে কয়েকটি পংক্তি তুলে দেবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। বাবার সঙ্গে পরিচয় হবার পর্বটি বর্ণনা করে তারপর নীরদবাবু লিখছেন-

We soon became very intimate, and I may add that he was one of only three of four persons outside my family with whom I became at all so in personal relations. He told me the very first evening that he had already published a story in the foremost Bengali monthly Prabasi. As soon as he mentioned its title I recalled it, for I had read it, and although I did not remember the name of the writer I had thought that it showed great originality and a delicate sensibility. I might mention here that in less than ten years he became one of the leading Bengali writers of fiction. His first novel, Published in 1928, at once established his position, and the book his now become known all over the world in its film version by Satyajit Ray. It is Pather Panchali. In 1924, as soon as he had written the first few pages, he read them out to me. I felt so confident about it that I prodded him for three years to finish it. After its publication as a serial in 1928 I was able to secure a publisher for the novel in book form.

ওপরের উদ্ধৃতিতে নীরদবাবু প্রথমদিকে 'Published in ১৯২৮' বলতেন নিশ্চয় 'বিচিত্রা'-র- পাতায় ধারাবাহিক প্রকাশের কথা বলেছেন, কারণ কয়েকলাইন পরেই তিনি তারিখসহ সে কথার উল্লেখ করেছেন। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা বললেও সেক্ষেত্রে সালের উল্লেখ করেন নি।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে নীরদবাবুর সশ্রদ্ধ মনোভাবের কারণ ছিল বাবার ব্যাপক অধ্যয়ন এবং অসূয়াহীন সরল ব্যক্তিত্ব। আর্থিক অসুবিধার জন্য বাবা এম. এ পড়তে পারেন নি, আইন পড়া শুরু করেও বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। সাধারণ একজন গ্রাজুয়েটের পক্ষে পড়াশুনোর এমন ব্যাপকতা ও গভীরতা নীরদবাবুকে বিস্মিত করেছিল। কিছুটা স্পষ্টবাদী এবং চিরাচরিত ধ্যানধারণার বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রকৃত পণ্ডিত ও গুণগ্রাহী। উভয়পক্ষের এই চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁদের বন্ধুত্বকে দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিভূতিভূষণের অধ্যয়ন প্রসঙ্গে নীরদবাবু বলেছেন)

I acquired a great respect for his mind, which had a wide range of interests. But I certainly did not expect a young Bengali of his class and education to show interest in astrophysics and human planetology, which he did. He would talk to me of E.P. Hubble, the astronomer at Mount Wilson Observatory, and his theories, although he had never been a student either of mathematics or physics. I had heard about Jeans and Eddington, and had also read a little by or about them. I had Einstein's book on Relativity as well. But I had not heard of Hubble, Bibhuti Babu also showed me Sir Arther Keith's Antiquity of Man, which in spite of his want of means he had bought … what I did immediately was to make Bibhuti Babu buy Burckit's Prehistory, when it was published in 1923, of course to read it myself. [6]

এই ধরনের মজা, তখনকার দিনে ছিল। বিভূতিভূষণের আর্থিক অবস্থার কথা জেনেও নীরদবাবু তাঁকে প্রাগিতিহাস বিষয়ক বার্কিটের বিখ্যাত বইটি ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, কারণ, তাঁর নিজেরও বৈষয়িক অবস্থা তখন বন্ধুরই সমান, অথচ বইখানা পড়তে চান। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ ঐস্বন্ধে তাঁর আর একটি পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গে ইতি টানছি। এতটাবলতে হল কারণ পথের পাঁচালীও বিভূতিভূষণের আলোচনা নীরদবাবু বাদ দিয়ে হয়না। তিনি লিখছেন)

He (Bibhutibhushan) never felt any envy or jealousy over the success or good fortune of fellow – writers. The writer class in not distinguished by this virtue, and in Bengali it is still less so. Bibhuti Babu was, however, immune to this meanness. Once, when to my thinking he was being lazy over the completion of his novel, I wrote to him that he must hurry up, because some others – I gave names – were already becoming well-established without having his ability. He replied that it did not matter, he did not grudge anybody's success, nor did he feel upset by his slowness. He would do what he wanted to do in his time, and he did. ৭

বাবার মৃত্যুর পর মা আমাকে নিয়ে বারাকপুরের বাপের বাড়ি চলে আসেন। শৈশব ও কৈশোরের বেশ কিছুদিন আমি মামাদের সঙ্গে তাঁদের ভাড়াবাড়িতে বাস করেছি। এই বাড়িতেই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের আলাপ হয়। বাড়ির নাম 'ভূতনাথ কুটির'। বর্তমান বারাকপুর শহীদ মঙ্গল পান্ডে সরণিতে বাড়িটি অর্ধভগ্ন অবস্থায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মালিকেরা সে বাড়ির অর্ধেক ভেঙে ফেলে আধুনিক সৌধ তুলেছেন, বাকিটাও খুব বেশিদিন থাকবে এমন আশা নেই। অথচ ওই বাড়িতে বিভূতিভূষণ এসে থেকেছেন বহুবার, এসেছেন প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বাণী রায়, সজনীকান্ত দাস, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, প্রমুখ তৎকালীন বহু বিখ্যাত মানুষ। বাবার অনেক গল্প এবং উপন্যাসের অংশ যেমন ইছামতী বা অশনিসংকেত) এখানে বসে লেখা। একটা সংস্কৃতি সচেতন বা ধনবান দেশে হলে বাড়িটির সংরক্ষণে উদ্যোগ নেওয়া হত, যেমন ইংল্যান্ডেবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভূতিভূষণের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ লেখকের ক্ষেত্রে ঘটেছে। শুনেছি নিউজিল্যান্ড যাঁকে নিয়ে গর্ব করে সেই ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ডের বাড়িও সেখানে মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে। আর আমাদের দেশে পথের পাঁচালী-র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে বাড়িতে সেটি ভেঙে ফেলা হল।

সে সময়কার জনা দুয়েক প্রথিতযশা এবং বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সফল পরিচালক প্রযোজক মায়ের কাছে এসেছি লেন পথের পাঁচালী-র চিত্রস্ফত্ব ক্রয় করবার জন্য। কিন্তু কীভাবে ছবি করবেন সে বিষয়ে তাঁদের পরিকল্পনা শুনে মা তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাঁদের মধ্যে একজন মা বলেছিলেন আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না, আমার সব ছবিই আজ পর্যন্ত বাজারে হিট করেছে। এ ছবির জন্যও গান লেখা, সুর দেওয়া ইত্যাদি হয়ে গিয়েছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে অপু-দুর্গা বাউল সুরে গান গাইতে গাইতে দৌড়চ্ছে, দুর্গার মৃত্যুতে একটা এমন করুণ সুরের গান দেব যা শুনে দর্শকেরা চোখের জল ধরে রাখতে পারবেনা। আপনাকে কত দিতে হবে বলুন।

শুনতে শুনতে সন্ত্রস্ত হয়ে মা বললেন) কিছু মনে করবেন না, পথের পাঁচালী-র স্ফত্ব আমি বিক্রি করবো না।

পরিচালক মশাই-এর অহংবোধে আঘাত লাগত। তাঁকে গল্পের স্বত্ব দিতে পারলে লেখকেরা গৌরববোধ করেন এটা দেখাই তাঁর অভ্যাস। একটি চেকের পাতায় স্ফাক্ষর করে মাকে দিয়ে তিনি বললেন - নিন, আপনাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিলাম। ইচ্ছেমত অঙ্ক বসিয়ে টাকাটা তুলে নিন। আমার চেক বাউন্স করবে না। কিন্তু পথের পাঁচালী-র ফিল্ম রাইট আমার চাই।

চেকটা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে মা সবিনয় বলেছিলেন) টাকার প্রশ্ন নয়, আমার স্বামী পথের পাঁচালী - কে নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। টাকার জন্য কেউ আপন সন্তানকে বিক্রি করে না।

সেই যুগটায় প্রকাশন জগতে মুদ্রণসৌকর্য, সম্পাদনা, প্রকাশিতব্য পুস্তক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ রুচির পরিচয়দিতেন তাঁদের মধ্যে সিগনেট প্রেস-এর দিলীপকুমার গুপ্ত বা ডি. কে ছিলেন অন্যতম। ইনি বিভূতিভূষণের তিনটি বই প্রকাশ করেছিলেন। চাঁদের পাহাড়, আম আঁটির ভেঁপু এবং দুই বাড়ি। প্রথমটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আর ভেতরের ছবি শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। দ্বিতীয়টি পথের পাঁচালী-র কিশোরপাঠ্য সংস্করণ। এটির প্রচ্ছদ এবং ভেতরের অলংকরণ সবটাই সত্যজিৎবাবুর করা। তৃতীয়টির প্রচ্ছদ তৈরী করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ডি. জে. কীমার নামে বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্ণধার ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। আম আঁটির ভেঁপু-র অলংকরণের দায়িত্ব তিনি সত্যজিৎবাবুর ওপরে ন্যস্ত করেন। সত্যজিৎবাবুর ডি.জে. কীমার কোম্পানীতে কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন, আবার সিগনেট প্রেসের কিছু কাজও করে দিতেন। ছবি আঁকার প্রয়োজনে বইটি পড়ে মূল গ্রন্থটিও পাঠ করেন। কিছুদিন আগে থেকেই সত্যজিৎবাবু চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভাবছিলেন। ঠিক করেছিলেন একেবারে বাঙালি জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করবেন। পথের পাঁচালী পড়ে ওঁর মনে হল এর চেয়ে ভাল গল্প আর কিছু হতে পারে না। কাজের ফাঁকে উনি ছবির জন্য একটি চিত্রনাট্য রচনাও সুরু করলেন।

পথের পাঁচালী কেন পছন্দ করেছিলেন সে বিষয়ে সত্যজিৎবাবু বলেছেন)

Bibhutibhushan Banerjee's Pather Panchali was serialized in a popular Bengali magazine in the early 1930s[8]. The Author had been brought up in a village and the Book contained much that was autobiographical. The manuscript had been turned down by the publishers on the grand that it lacked a story. The magazine, too, was initially reluctant to accept it, but later did so on condition that it would be discountinued if the readers so wished. But the story of Apu and Durga was a hit from the first instalment. The book, published a year or so later, was an outstanding critical and popular success and has remained on the best seller list ever since.

I chose Pather Panchali for the qualities that made it a great book, its, Humanism, its lyricism, and, ring of truth… I felt that to cast the thing into a mould of cut-and-dried narrative would be wrong. The script had to retain some of the rambling quality of the novel because that in it self contained a clue to the feel of authenticity: life in a Bengali village does ramble.

…I had my nucleus: the family, consisting of husband and wife, the two children, and the old aunt. The characters had been so conceived by the author that there was a constant and subtle interplay between them… what I lacked was first – hand acquaintance with the milieu of the story. I could, of course, draw upon the book itself, which was a kind of encyclopaedia of Bengal rural life…[9]

দিলীপকুমার গুপ্ত একদিন সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বারাকপুর আমাদের বাড়িতে এলেন। মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন - ইনি পথের পাঁচালী নিয়ে একটি ছবি করতে চান।

সে দিনটার কথা আমার এখনো বেশ পড়ে। দেখলাম দিলীপকাকার সঙ্গে একজন খুব লম্ফা মানুষ এসেছেন। ভারি, গম্ভীর গলা। ইংরেজিতে যাকে বলে deep baritone voice¼ যতদূর মনে করতে পারি পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরা ছিল। বারান্দায় পাতা দাদামশায়ের তক্তাপোষে বসলেন।

আলাপ-পরিচয় হবার পর সত্যজিৎবাবুর প্রস্তাব শুনে মা যথারীতি মার্জনা চাইলেন এবং পথের পাঁচালী-র চিত্রস্ফত্ব দেওয়ারব্যাপারে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলেন। দিলীপবাবু কিন্তু আদৌ হতোদ্যম হলেন না। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন) দেওয়া বা না-দেওয়া আপনার ইচ্ছা, কিন্তু একটা কথা অন্তত বলুন, কেন আপনি স্বত্ব দিতে দ্বিধাবোধ করেছেন ?

আগের প্রযোজক - পরিচালকদের যা বলেছিলেন এঁদেরও মা তাই বললেন। উত্তরে দিলীপবাবু বললেন - এই মানুষটি কিন্তু সাধারণত আমরা যাকে 'সিনেমা' বা 'বই' বলে থাকি তেমন ছবি করবেন না। এটাই হবে ওঁর প্রথম ফিল্ম। এঁর আর একটা পরিচয় আপনাকে বলা হয়নি। ইনি হচ্ছেন সুকুমার রায়ের ছেলে, উপেন্দ্রকিশোরের নাতি।

এবার মা একটু অন্যভাবে সত্যজিৎবাবুর দিকে তাকালেন। পরিচয় শুনে মনের ভেতরে কোথাও একটা নরম তন্ত্রীতে বোধহয় আঘাত করল। মা জানতে চাইলেন সত্যজিৎবাবু কীভাবে ছবিটি করার কথা ভেবেছেন। উনিও মাকে বোঝাতে লাগলেন।

একদিনে হল না। বেশ কয়েকবার সত্যজিৎবাবু এলেন। বিস্তৃত আলোচনা হতে লাগল। একটু একটু করে মায়ের বিশ্বাস জন্মাল - যদি পথের পাঁচালী নিয়ে কেউ ছবি করতে পারেন, তাহলে তিনি এই মানুষটি।

আর একটা জিনিস মায়ের মনের ভেতর ক্রিয়া করেছিল, তা হলে দিলীপকুমার গুপ্তের উপস্থিতি। দিলীপবাবুর রুচি এবং শিল্পবোধের ওপরে মায়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যোগ্য না মনে

করলে তিনি কারুকে সঙ্গে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিতেন না এই ধারণা, এবং সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আলোচনালব্ধ প্রতীতি - এই দুটি বিষয়কে বিবেচনা করে মা অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র স্বত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তি বদলে দিল ভারতীয় তথা বিশ্ব - চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ। এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল দুজন মানুষের জন্য। প্রথম, দিলীপকুমার গুপ্ত, যাঁর মধ্যস্থতা ব্যতীত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আগ্রহীই হতেন না। দ্বিতীয়, আমাদের মাতৃদেবী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি ব্ল্যাঙ্ক চেকে ইচ্ছেমত টাকার রাশি বসিয়ে নেওয়ার প্রলোভন অনায়াসে উপেক্ষা করে মাত্র পাঁচশত টাকা অগ্রিম নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাবা তখন মাত্র আড়াই তিন বছর হল মারা গিয়েছেন, কোনো হিসেবের খাতা বা কার কাছে কী পাওনা জানিয়ে যেতে পারেন নি। এসব বৈষয়িকতার জটিলতায় প্রবেশ করা তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। রীতিমত অনটনের মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে তখন আমাদের সংসার চলছে। কেবলমাত্র বিভূতিভূষণের স্নেহধন্য এবং অনুজপতিম সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ, 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনের যুগ্ম-কর্ণধার, সহৃদয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন। নাবালক সন্তান নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় পাওয়ার জন্য মায়ের যে কৃতজ্ঞতার বোধ তুলে নিয়ে। দাদামশাই তখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সামান্যই পেনশন পেতেন। এদিকে বিরাট সংসার, মা-বাবা, অনেক ভাই-বোন, পরিচারক-পরিচারিকা নিয়ে বহু সদস্য। এর সব দায়িত্ব মাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় অর্থলোভ পরিত্যাগ করে সঠিক মানুষের হাতে সঠিক জিনিসটি প্রায় কোনো বৈষয়িক লাভ ছাড়াই তুলে দেওয়ার উদারতা তিনি দেখাতে পেরেছিলেন। বড় বড় দিক - পরিবর্তনকারী ঘটনার পেছনে বহুক্ষেত্রেই একটি দুটি নীরব ব্যক্তিত্ব থাকে। ইতিহাসে রমাদেবীর নাম চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের প্রেরণাদাত্রীএবং পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় সচেতনতা আজকের দিনে বিভূতি - গবেষণাকে সহজ ও সম্ভব করেছে। বাংলার সংস্কৃতিপ্রেমিকেরা যেন একথাটা ভুলে না যায়। তাঁরা যেন মনে রাখেন W.H.AUDEN-এর 'A Shilling Life'-এ বর্ণিত মহামানবের সেই নিকট সঙ্গিনীর কথা, যে নীরব নম্রমুখী মেয়েটি খ্যাতনামা মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে মানুষটির ঐহিক অস্তিত্বকে ধরে রেখেছিল এবং তাঁর মহত্ত্বকে বিকশিত হতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু যার কথা সেই মহামানবের জীবনীতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখিত হয়না।

পথের পাঁচালী-র চিত্রগ্রহণ শুরু হল কলকাতা শহরের দক্ষিণতম প্রত্যন্ত পার হয়ে বোড়াল গ্রামে। এখন আর তা গ্রাম নয়। ছবিতে দেখতে পাওয়া সেই বাঁশবন, আসশ্যাওড়া আর ভাঁট ফুলের জঙ্গল, কাশবন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। এখন সেখানে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগা বাড়ি, উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক, দোকানপাট এবং পোড়া ডিজেল ও পেট্রলের গন্ধ। যাইহোক, কিছুদূর করে শুটিং অগ্রসর হওয়ার পরে সত্যজিৎবাবু মাকে রাশ দেখাতে নিয়ে যেতেন আরোরা স্টুডিওর ছোট প্রোজেকশান রুমে। সঙ্গে থাকতাম আমি আর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ। তখনও ম্যারেড প্রিন্ট তৈরী হয়নি, সম্পাদনাও হয়নি, সাইলেন্ট রাশ। এখনও মনে পড়ে শব্দহীন সেই সব দৃশ্য - অপু ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে, বাতাসে উল্টে যাচ্ছে পদ্মের পাতা, জলের ওপরে মাকড়শার মত হালকা পোকাগুলিঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে বেশ কয়েকবার যাওয়া এবং দেখা। প্রত্যেকবারই সত্যজিৎবাবু প্রোজেকশান শেষ হলে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। একবার মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন - আচ্ছা, আমি তো ফিল্মের জগতের মানুষ নই, একজন সাধারণ গৃহবধু মাত্র। আমার মতামত আপনার কী কাজে লাগবে?

ছবি তৈরি শেষ হয়ে গেল। মুক্তির দিন স্থির হল ১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্ট, বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে। তার আগের দিন, অর্থা ২৫ তারিখটা মায়ের কেমন কেটেছিল সেই গল্প মা পরবর্তীকালে প্রায়ই করতেন। প্রায় সারারাত্তির জেগে মা ঘরে পায়চারি করেছিলেন। দেয়ালে টাঙানো বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলেছিলেন - তুমি চলে গিয়েছ, এই জীবনে প্রথম তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছি। তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমার এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতকালে উপহাসের বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়।

এইভাবে একসময় রাত ফুরিয়ে সকাল হয়ে গেল।

যতদূর মনে পড়ে প্রেস শো হয়েছিল সকালের দিকে। বিধানচন্দ্র রায়, মা এবং সত্যজিৎবাবু পাশাপাশি বসেছিলেন। আমরা পরিবারের সদস্যরা একটা পাশে। অপুর ভূমিকাভিনেতা সুবীর বন্দোপাধ্যায় -এর সঙ্গে সেদিন পরিচয় হয়েছিল কিনা এখন আর মনে নেই। পরে কিন্তু রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন সুবীর এসে আমার সহপাঠী হয়েছিল। সে বন্ধুত্ব এখনও অটুট আছে।

এর পরের ঘটনাবলী তো সুবিদিত ইতিহাস। সকলেই জানেন। কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে Best Human Document পুরস্কার প্রাপ্তি, 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' নিয়ে অপুত্রয়ীয় নির্মাণ, সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে সত্যজিৎবাবুর আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ, এ সমস্তের পেছনে যে নিতান্ত ঘরোয়া অকথিত ইতিহাস রয়েছে তা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা গেল। এই সময় থেকেসুরু করে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে 'অশনি সংকেত' নির্মাণ পর্যন্ত বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সঙ্গে এবং তাঁর পরেও পারিবারিক দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর সম্পর্ক ছিল মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ। জীবিতাবস্থায় শেষবার ওঁকে দেখি পুত্র সন্দীপ রায়ের বধূবরণ উৎসবে। সঙ্গে মা ছিলেন। সত্যজিৎবাবু তখন ভগ্নস্বাস্থ্য মাও গুরুতর অসুস্থ, চলবার সময় ধরে থাকতে হয়। দুজনে পাশাপাশি বসে পুরনো দিনের অনেক গল্প করেছিলেন। তার পরে ওঁকে দেখি নন্দন-এ ফুলের স্তূপের মধ্যে শায়িত। নিশ্চুপে মালা দিয়ে চলে এসেছিলাম।

বিভিন্ন সভা সেমিনার বা সারস্বত আড্ডায় প্রায়ই আমাকে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। সেটাই এই) 'পথের পাঁচালী' ছবিটি উপন্যাসের কতটা সফল চিত্ররূপ, বা সিনেমাটি উপন্যাসের কথাবস্তু ও ভাবের সম্পূর্ণভাবে অনুসারী কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। স্কুলের পড়ার সময় কিঞ্চিৎ সরলবুদ্ধি সহপাঠীদের আমরা একটা গাণিতিক বাঁধা জিজ্ঞাসা করে চমকে দিতাম। 'একসের আলুর দাম আটআনা হলে দেড়পোয়া পটলের নাম দাম কত?' বেচারী সহপাঠী সারাদিন ভেবেও উত্তর খুঁজে পেত না। এ প্রশ্নও অনেকটা সেই রকম। ফিল্ম্ এবং সাহিত্য, শিল্পের দুই পৃথক শাখা। যদিও যতদূর জানি একমাত্র জাঁ লুক গোদার ছাড়া ক্যামেরার লেন্স্কে পরিচালক বা গল্পকথকের দৃষ্টিকোণ হিসেবে ব্যবহার করে ফিল্ম্কে কাহিনীমূলক সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস অন্য কেউ করেন নি। মোটমুটিভাবে প্রত্যেক পরিচালক ছবি শুরু করার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে একটি কাহিনির কথা ভাবেন, তা সে অন্য কারো লেখাই হোক বা নিজের রচনাই হোক। কেবল এইটুকু যোগাযোগ বাদ দিলে একটি শিল্পরূপের সঙ্গে অপরটিকেপ্রতি বিন্দুতে মেলানোর চেষ্টা শিল্পোপভোগের সঠিক পন্থা নয়। তবে এক্ষেত্রে উপভোক্তার ব্যক্তিগত পছন্দের প্রশ্ন থেকেই যায়। আমি দেখেছি এই প্রসঙ্গে মানুষ দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন, 'পথের পাঁচালী' ছবিটি যে কেবলমাত্র অনবদ্য একটি শিল্পসৃষ্টি তানয়। এটি উপন্যাসের একটি অত্যন্ত সার্থক চলচ্চিত্রায়ণও বটে। উপন্যাসে বর্ণিত বাংলার গ্রামজীবন দারিদ্র্য, প্রকৃতি ও পরিবেশ সবই আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে যথাযথ ভাবে পরিবেশিত। অন্যদল বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'পথের পাঁচালী একটি অনবদ্যচলচ্চিত্র। কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাস পাঠে যে গভীর নান্দনিক তৃপ্তি, প্রকৃতির সজীব সংস্পর্শ এবং লেখকের জীবনদর্শন - যা একাধারে ধ্রুপদী এবং রোমান্টিক, তার ছোঁয়া পাওয়া যায় না। এই দুই দলের মধ্যে কোন্ দল ঠিক কথা বলছেন তা নিয়ে বোধহয় কোনো বিতর্ক থাকা উচিত নয়। কারণ শিল্প গণিতের সূত্র মেনে চলে না। একটি প্রশ্নের কেবলমাত্র একটিই উত্তর দিতে হবে এবং কোনো অনুজ্ঞা শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। বিচারকের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হলে প্রতিটি বিচারেই কিছু প্রভেদ থাকবে, এবং তার কোনোটিই অপরটির চেয়ে বেশি সত্য বা মিথ্যা নয়। নন্দনতত্ত্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদেরাও এই মতকে সমর্থন করেন। এই কারণেই বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু শিল্প সত্য এবং সুন্দর। আমার পরিবারের সদস্যেরা এই দুই মতকে সমান শ্রদ্ধা করে থাকেন।

আসলে যে শিল্পের যে নিয়ম। কান দিয়ে রঙ চেনা যায় না। রসনা দ্বারা সঙ্গীত শ্রবণ করা যায় না। তেমনই বিভিন্ন অনুভূতির এবং উপলব্ধির জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্পর্শকেন্দ্র আছে। উপন্যাস পাঠ করে একজন যে তৃপ্তি লাভ করেন, সেটির চলচ্চিত্ররূপ হয়তো বা তাঁকে একই ভাবের মুখোমুখি নাও করতে পারে, অথবা চলচ্চিত্র প্রেমীর ক্ষেত্রে হয়তো এর উল্টোটাই সত্য। বিতর্কবৃথা।

পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণকে গণপরিচিতির তুঙ্গে তুলেছে। আরণ্যক, অনুবর্তন, ইচ্ছামতী বা বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো অন্তত পঞ্চাশটি গল্পেরও যে তিনি সার্থক রচয়িতা, সে কথা অনেক সময়েই আমরা বলতে ভুলে যাই। আমজনতার কাছে বিভূতিভূষণের পরিচয় পথের পাঁচালী-র লেখক হিসেবে। বিশ্বের অনেক সাহিত্যিকের কপালেই এই দুর্ভোগ ঘটেছে। ওয়াশিংটন অর্ভিং-এর রিপভ্যান্ উইঙ্কল্ সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁর লিজে' অফ দি স্লিপি হলো-র মত আশ্চর্য সুন্দর রচনা কজন পড়ে?রবিনস ক্রুশো চিরকালের ক্লাসিক, কিন্তু কজন জানে মল ফ্ল্যানডারস্ নামে তাঁর একটি ধ্রুপদী রচনা আছে? অনেকক্ষেত্রেই একটিমাত্র রচনাই লেখককে অমর করে। তবে একটা ভালো দিক এই যে, বিভূতিভূষণের অনুরাগীরা তাঁর অন্যান্য রচনার তাৎপর্যকে পুরোপুরি বিস্মৃত হননি। প্রকৃতির পূজারী হিসাবে, বিশেষ করে আরণ্যক-এর প্রসঙ্গে তাঁকে উইলিয়াম হেনরি হাডসন, ক্নুট্ হাসসুন বা হেনরি ডেভিড - থোবোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র দৃশ্যসত্য আরণ্যপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যকে পার হয়ে সমধর্মী সাহিত্যিকদের চেয়ে উচ্চতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

যাঁরা পথের পাঁচালী ভালোবাসেন, আমিও তাঁদেরই দলে। বহু শতাব্দীতে কোনো ভাষায় এমন একটি সাহিত্য নির্মাণ সংযোজিত হয়। বিভূতিভূষণ জীবিত থাকলে তাঁর বয়স হত একশো বারো। মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন - মহাকাল তার সূর্প নিয়ে বসে ঝাড়াই-বাছাই করছেন। অযোগ্য বা দুর্বল রচনা বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতার জোরে কখনোই পরবর্তীযুগে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে না। একথা অনুযায়ী, এখন অবধি যতখানি। জনপ্রিয়তার বিচারে এই মুহূর্তে তিনি তৃতীয় স্থান (প্রথম ও দ্বিতীয় অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ্য শরৎচন্দ্র, এখনও) এখানে পৌঁছবার

জন্য তাঁকে কোনো ‘লবি’ করতে হয়নি, পেতে হয়নি নামি - দামি পত্রিকার কিম্বা রাজনৈতিকগোষ্ঠীর সানুগ্রহ দাক্ষিণ্য। পেয়েছিলেন মহাকালের আশীর্বাদ, যা তাঁকে নীত করেছে শাশ্বতের ঘরে। আর ছিল বুকের গভীরে মানুষের প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসা। সুদূর, নির্জন প্রবাসে ইসমাইলপুর কাছারিতে বসে ভাবছেন - আমার টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রাখা এই ফুলটা আজ থেকে আশি বছর পরে কোথায় থাকবে? রক্তমাংসের এই অতি বাস্তব আমি - আমি কোথায় থাকব আশি বছর পরে? যদি লেখক হই, তাহলে ততদিনে অনেক পুরানো দিনের এক বিস্মৃত লেখক হয়ে যাব, আমার বইপত্র হয়ত কেউ বড় একটা আর ছোঁবে না। তবু সেই অনাগত যুগের কাছে বর্তমান কালের মানুষের হাসি - কান্নার কাহিনি পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে কলম ধরতে হবে। সেই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানবসেবা। তারপর মানুষ তা মনে রাখুক, আর নাই রাখুক।